

মাসিকপত্রের গল্পের মত জগৎ-পদার্থটি ক্রমশ প্রকাশ্য। সৃষ্টির বইখানি আত্মোপাস্ত লেখা হয়ে গেছে, শুধু প্রকৃতির ছাপাখানা থেকে অল্প-অল্প করে বেরচ্ছে, এবং যে অংশটুকু বেরিয়েছে তার থেকেই তার রচনাপ্রণালীর ধরণ আমরা জানতে পেরেছি। সে প্রণালী হচ্ছে ক্রমোন্নতি, অর্থাৎ যত দিন যাবে তত সমস্ত জগতের এবং তার অন্তর্ভূত জীবজগতের এবং তার অন্তর্ভূত মানবসমাজের এবং তার অন্তর্ভূত প্রতি মানবের উন্নতি অনিবার্য। প্রকৃতির ধর্মই হচ্ছে আমাদের উন্নতি সাধন করা। সুতরাং আমাদের তার জ্ঞান নিজের কোনো চেষ্টার আবশ্যক নেই। আমরা শুয়েই থাকি আর ঘুমিয়ে থাকি, জাগতিক নিয়মের বলে আমাদের উন্নতি হবেই। এই কারণেই এই ক্রমোন্নতিবাদ-আকারে ইভলিউশন আমাদের স্বাভাবিক জড়তা এবং নিশ্চেষ্টতার অনুকূল মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া এই 'ক্রম'-শব্দটি আমাদের মনের উপর এমনি আধিপত্য স্থাপন করেছে যে, সেটিকে অতিক্রম করা পাপের মধ্যে গণ্য হয়ে পড়েছে। তাই আমরা নানা কাজের উপক্রমণিকা করেই সন্তুষ্ট থাকি, কোনো বিষয়েরই উপসংহার করাটা কর্তব্যের মধ্যে গণ্য করি নে; প্রস্তাবনাতেই আমাদের জীবন-নাটকের অভিনয় শেষ হয়ে যায়। কিন্তু আসলে ইভলিউশন ক্রমবিকাশও নয় ক্রমোন্নতিও নয়। কোনো পদার্থকে প্রকাশ করবার শক্তি জড়প্রকৃতির নেই, এবং তার প্রধান কাজই হচ্ছে সকল উন্নতির পথে বাধা দেওয়া। ইভলিউশন জড়জগতের নিয়ম নয়, জীবজগতের ধর্ম। ইভলিউশনের মধ্যে শুধু ইচ্ছাশক্তিরই বিকাশ পরিস্ফুট। ইভলিউশন-অর্থে দৈব নয়, পুরুষকার। তাই ইভলিউশনের জ্ঞান মানুষকে অলস হতে শিক্ষা দেয় না, সচেতন হতে শিক্ষা দেয়। আমরা ভুল তরঙ্গমা করে ইভলিউশনকে আমাদের চরিত্র-হীনতার সহায় করে এনেছি।

ইউরোপীয় সভ্যতার, হয় আমরা তরঙ্গমা করতে কৃতকার্য হচ্ছি নে, নয় ভুল তরঙ্গমা করছি, তাই আমাদের সামাজিক জীবনে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না, বরং অপচয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। অথচ আমাদের বিশ্বাস যে আমরা দু পাতা ইংরেজি পড়ে নব্যব্রাহ্মণসম্প্রদায় হয়ে উঠেছি। তাই আমরা নিজেদের শিক্ষার দৌড় কত সেবিষয়ে লক্ষ্য না করে জনসাধারণকে শিক্ষা দিবার জ্ঞান ব্যস্ত হয়ে উঠেছি। এ সত্য আমরা ভুলে যাই যে, ইউরোপীয় সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান থেকে যদি আমরা নতুন প্রাণ লাভ করে থাকতুম তাহলে জনসাধারণের মধ্যে আমরা নবপ্রাণের সঞ্চারও করতে পারতুম। আমরা অধ্যয়ন করে যা লাভ করেছি তা অধ্যাপনার দ্বারা দেশস্বল্প লোককে দিতে পারতুম। আমরা আমাদের cultureকে nationalize করতে পারি নি বলেই গবর্নমেন্টকে পরামর্শ দিচ্ছি যে আইনের দ্বারা বাধ্য করে জনসাধারণকে

শিক্ষা দেওয়া হোক। মাণ্ডবর শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ গোখলে যে হুজুগটির মুখপাত্র হয়েছেন, তার মূলে ইউরোপের নকল ছাড়া আর কোনো মনোভাব নেই। তাই গবর্নমেন্টকে ভজাবার জ্ঞান দিবারাত্রি খালি বিলেতি নজিরই দেখানো হচ্ছে। শিক্ষা-শব্দেব অর্থ শুধু লিখতে ও পড়তে শেখা হয়ে দাঁড়িয়েছে। গবর্নমেন্টই স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করে আমাদের লিখতে পড়তে শিখিয়েছেন। সুতরাং গবর্নমেন্টকে গ্রামে গ্রামে স্কুল স্থাপন করে রাজিাম্বন্ধ ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাতেই হবে, এই হচ্ছে আমাদের হাল রাজনৈতিক আবদার। যতদিন পর্যন্ত আমরা আমাদের নব-শিক্ষা মজ্জাগত করতে না পারব ততদিন জনসাধারণকে পড়তে শিখিয়ে তাদের যে কি বিশেষ উপকার করা হবে তা ঠিক বোঝা যায় না। আমরা আজ পর্যন্ত ছোটছেলেদের উপযুক্ত একখানিও পাঠ্য পুস্তক রচনা করতে পারি নি। পড়তে শিখলে এবং পড়বার অবসর থাকলে এবং বই কেনবার সংগতি থাকলে প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত চাষার ছেলেরা সেই রামায়ণ-মহাভারতই পড়বে—আমাদের নব-শিক্ষার ভাগ তারা কিছু পাবে না। রামায়ণ-মহাভারতের কথা যে বইয়ে পড়ার চাইতে মুখে শোনা অনেক বেশি শিক্ষাপ্রদ, তা নব্যশিক্ষিত ভারতবাসী ছাড়া আর কেউ অস্বীকার করবেন না। মুখের বাক্যে প্রাণ আছে, লেখার ধ্বনিহীন বাক্য অধমরা। সে যাই হোক, আমাদের দেশের লৌকিক শিক্ষার জ্ঞান যদি আমাদের থাকত এবং সেই শিক্ষার প্রতি অযথা অবজ্ঞা যদি আমাদের মনে না স্থান পেত, তাহলে না-ভেবেচিন্তে, লোকশিক্ষার দোহাই দিয়ে, সেই চিরাগত লৌকিক শিক্ষা নষ্ট করতে আমরা উদ্বৃত হতুম না। সংস্কৃতসাহিত্যের সঙ্গে ঋগ্‌র পরিচয় আছে তিনিই জানেন যে, আমাদের পূর্বপুরুষেরা লোকাচার, লৌকিক ধর্ম, লৌকিক-শ্রায় এবং লৌকিক বিদ্যাকে কিরূপ মাণ্ড করতেন। কেবলমাত্র বর্ণপরিচয় হলেই লোকে শিক্ষিত হয় না; কিন্তু ঐ পরিচয় লাভ করতে গিয়ে যে বর্ণধর্ম হারানো অসম্ভব নয়, তা সকলেই জানেন। মাসিক পাঁচটাকা বেতনের গুরু-নামক গোরুর দ্বারা তাড়িত হওয়া অপেক্ষা চাষার ছেলের পক্ষে গুরু-তাড়ানো শ্রেয়। ‘ক’-অক্ষর যে-কোনো লোকের পক্ষেই গোমাংস হওয়া উচিত নয়, একথা আমরা সকলেই মানি। কিন্তু ‘ক’-অক্ষর যে আমাদের রক্তমাংস হওয়া উচিত, এ ধারণা সকলের নেই। কেবল স্বাক্ষর করতে শেখার চাইতে নিরক্ষর থাকার ভালো, কারণ পৃথিবীতে আঙুলের ছাপ রেখে যাওয়াতেই মানবজীবনের সার্থকতা। আমাদের আহার পরিচ্ছদ গৃহ মন্দির—সব জিনিসেই আমাদের নিরক্ষর লোকদের আঙুলের ছাপ রয়েছে। শুধু আমরা শিক্ষিতসম্প্রদায়ই ভারতমাতাকে পরিষ্কার বুদ্ধাঙ্কুঠ দেখিয়ে যাচ্ছি। পতিতের উদ্ধারকার্যটি খুব ভালো; ওর একমাত্র দোষ এই যে, ঋগ্‌র পরকে উদ্ধার করবার জ্ঞান ব্যস্ত তাঁরা নিজেদের উদ্ধার

সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। আমরা যতদিন শুধু ইংরেজির নীচে স্বাক্ষর দিয়েই ক্ষান্ত থাকব, কিন্তু সাহিত্যে আমাদের আঙুলের ছাপ ফুটবে না, ততদিন আমরা নিজেরাই যথার্থ শিক্ষিত হব না, পরকে শিক্ষা দেওয়া তো দূরের কথা। আমি জানি যে, আমাদের জাতিকে খাড়া করবার জন্য অসংখ্য সংস্কারের দরকার আছে। কিন্তু আর যে-কোনো সংস্কারের আবশ্যক থাক না কেন, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হাজার হাজার বটতলার সংস্কারের আবশ্যক নেই।

মাঘ ১৩১৯

বইয়ের ব্যাবসা

সাধারণত লোকের একটা বিশ্বাস আছে যে, বই-জিনিসটে পড়া সহজ কিন্তু লেখা কঠিন। অপর দেশে যাই হোক, এদেশে কিন্তু নিজে বই লেখার চাইতে অপরকে পড়ানো ঢের বেশি শক্ত। শুনতে পাই যে, কোনো বইয়ের এক হাজার কপি ছাপালে এক বৎসরে তার এক শ'ও বিক্রি হয় না। সাধারণ লেখকের কথা ছেড়ে দিলেও, নামজাদা লেখকদেরও বই বাজারে কাটে কম, কাটে বেশি পোকায়। বাংলাদেশে লেখকের সংখ্যা বেশি কিংবা পাঠকের সংখ্যা বেশি, বলা কঠিন। এবিষয়ে যখন কোনো স্ট্যাটিস্টিক্স পাওয়া যায় না, তখন ধরে নেওয়া যেতে পারে যে মোটামুটি দুই সমান। কেউ-কেউ এমন কথাও বলে থাকেন যে, লেখা ও পড়া এ দুটি কাজ অনেক স্থলে একই লোকে করে থাকেন। একথা যদি সত্য হয়, তাহলে অধিকাংশ লেখকের পক্ষে নিজের লেখা নিজে পড়া ছাড়া উপায়ান্তর নেই। কেননা, পরের বই কিনতে পয়সা লাগে, কিন্তু নিজের বই বিনে-পয়সায় পাওয়া যায়। অবশ্য কখনো-কখনো কোনো-কোনো বই উপহারস্বরূপে পাওয়া যায়, কিন্তু সেসব বই প্রায়ই অপাঠ্য। এরূপ অবস্থায় বঙ্গসাহিত্যের ক্ষুতি হওয়া প্রায় একরূপ অসম্ভব। কারণ, সাহিত্য-পদার্থটি যাই হোক না কেন, বই হচ্ছে শুধু বেচাকেনার জিনিস, একেবারে কাঁচামাল। ও মাল ধরে রাখা চলে না। গাছের পাতার মত বইয়ের পাতাও বেশি দিন টেকে না, এবং একবার ঝরে গেলে উলুন-ধরানো ছাড়া অল্প কোনো কাজে লাগে না।

এ অবস্থা যে সাহিত্যের পক্ষে শোচনীয় সেবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কার দোষে যে এরূপ অবস্থা ঘটেছে, লেখকের কি পাঠকের, সে কথা বলা কঠিন। অবশ্য লেখকের পক্ষে এই বলবার আছে যে, এক টাকা দিয়ে একখানি বই কেনার চাইতে, এক শ টাকা দিয়ে একখানি বই ছাপানো ঢের বেশি কষ্টসাধ্য। অপরপক্ষে পাঠক বলতে পারেন যে, এক শ'টি টাকা অন্তত ধার করেও যে-সে বাংলা বই ছাপানো যেতে পারে, কিন্তু নিজের বুদ্ধি অপরকে ধার না দিয়ে যে-সে বাংলা বই পড়া যেতে পারে না। অর্থকষ্টের চাইতে মনঃকষ্ট অধিক অসহ্য। আমার মতে দু পক্ষের মত এক হিসেবে সত্য হলেও আর-এক হিসেবে মিথ্যা। বই লিখলেই যে ছাপাতে হবে, এইটি হচ্ছে লেখকদের ভুল; আর বই কিনলেই যে পড়তে হবে, এইটি হচ্ছে পাঠকদের ভুল। বই-লেখা-জিনিসটে একটা শখমাত্র হওয়া উচিত নয়, কিন্তু বই-কেনাটা শখ ছাড়া আর-কিছু হওয়া উচিত নয়।

বাংলাদেশে বাংলাসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হওয়া উচিত কি না, সেবিষয়ে আমি কোনো

আলোচনা করতে চাই নে। কারণ, সাহিত্য-শব্দ উচ্চারণ করবামাত্র নানা তর্কবিতর্ক উপস্থিত হয়। অমনি চারধার থেকে এইসব দার্শনিক প্রশ্ন ওঠে, সাহিত্য কাকে বলে, সাহিত্যে কার কি ক্ষতি হয় এবং কার কি উপকার হয়? তারপর সাহিত্যকে সমাজের শাসনাধীন করে তার শাস্তির জ্ঞান সমালোচনার দণ্ডবিধি-আইন গড়বার কথা হয়। সমালোচকেরা একাধারে ফরিয়াদি উকিল বিচারক এবং জন্মদ হয়ে ওঠেন। স্মতরাং কথাটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, সাহিত্য যে কি সেসম্বন্ধে যখন এখনো একটা জাতীয় ধারণা জন্মে যায় নি, তখন এ বিষয়ে এক কথা বললে হাজার কথা শুনতে হয়। কিন্তু বই-জিনিসটে কি, তা সকলেই জানেন। এবং বাংলা বই যে বাজারে চলা উচিত সেবিষয়ে বোধ হয় দু-মত নেই, কারণ ও-জিনিসটে স্বদেশী শিল্প। যদি কারও এবিষয়ে সন্দেহ থাকে, তাহলে তা ভাঙাবার জন্তে দেখিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে, নব্য স্বদেশী শিল্পের যে দুটি প্রধান লক্ষণ সে দুটিই এতে বর্তমান। প্রথমত নব্যসাহিত্য-পদার্থটা স্বদেশী নয়, দ্বিতীয়ত তাতে শিল্পের কোনো পরিচয় নেই।

লেখা-ব্যাপারটা যতদিন আমরা মাস্তুলের একটা প্রধান কাজ হিসেবে না দেখে বাজে শখ হিসেবে দেখব, ততদিন বইয়ের ব্যাবসা ভালো করে চলবে না। স্মতরাং বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি, অর্থাৎ বিস্তার, করতে হলে আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, এ যুগে সাহিত্য প্রধানত লেখাপড়ার জিনিস নয়, কেনাবেচার জিনিস। কোনো রচনাকে যদি অপরে অমূল্য বলে তাহলে রচয়িতার রাগ করা উচিত, কারণ সে পদার্থের মূল্য নেই, তা যত্ন করে পড়া সকলের পক্ষে সম্ভব নয়।

ব্যাবসার দুটি দিক আছে: প্রথম, প্রোডাকশন (তৈরি করা), দ্বিতীয়ত, ডিস্ট্রিবিউশন (কাটানো)। মানবজীবনের এবং মালের জীবনের একই ইতিহাস, তার একটা আরম্ভ আছে একটা শেষ আছে। যে তৈরি করে তার হাতে মালের জন্ম এবং যে কেনে তার হাতে তার মৃত্যু। জন্ম-মৃত্যু পর্যন্ত কোনো-একটি মালকে দশ হাত ফিরিয়ে নিয়ে বেড়ানোর নাম হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশন। স্মতরাং বইয়ের জন্মবৃত্তান্ত এবং ভ্রমণবৃত্তান্ত দুটির প্রতিই আমাদের সমান লক্ষ্য রাখতে হবে।

এস্থলে বলে রাখা আবশ্যিক যে, আমি সাহিত্যব্যাবসায়ী নই; অর্থাৎ অগ্ণাবধি বই আমিই কিনেই আসছি, কখনো বেচি নি। স্মতরাং কি কি উপায় অবলম্বন করলে বই বাজারে কাটানো যেতে পারে, সেবিষয়ে আমি ক্রেতার দিক থেকে যা বলবার আছে তাই বলতে পারি, বিক্রেতা হিসেবে কোনো কথাই বলতে পারি নে।

সচরাচর দেখতে পাই যে, বই বিক্রি করবার জন্তে বিজ্ঞাপন দেওয়া, অর্ধমূল্যে কিংবা সিকি-মূল্যে বিক্রি করা, ফাউ দেওয়া এবং উপহার দেওয়া প্রভৃতি উপায় অবলম্বন করা হয়ে থাকে।

এসকল উপায়ে যে বইয়ের কাটতির কতকটা সাহায্য করে সেবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু সেইসঙ্গে বাধাও যে দেয় সে ধারণাটি বোধ হয় বিক্রেতাদের মনে তত স্পষ্ট নয়।

প্রথমত, বিশখানি বইয়ের যদি একসঙ্গে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় এবং তার প্রতিখানিকেই যদি সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়, তাহলে তার মধ্যে কোন্খানি যে কেনা উচিত, সেবিষয়ে অধিকাংশ পাঠক মনস্থির করে উঠতে পারে না। অপরাপর মালের একটি সুনির্দিষ্ট শ্রেণীবিভাগ আছে। বিজ্ঞাপনেই আমাদের জানিয়ে দেয় যে, তার মধ্যে কোন্টি পয়লা নম্বরের, কোন্টি দোসরা নম্বরের, কোন্টি তেসরা নম্বরের ইত্যাদি; এবং সেই ইতরবিশেষ-অনুসারে দামেরও তারতম্য হয়ে থাকে। সুতরাং সেসব মাল কিনতে ক্রেতাকে বাঁশবনে-ডোমকানা হতে হয় না, প্রত্যেকে নিজের অবস্থা এবং রুচি অনুসারে নিজের আবশ্যকীয় জিনিস কিনতে পারে। কিন্তু বই সম্বন্ধে এরূপ শ্রেণীবিভাগ করে বিজ্ঞাপন দেওয়া সম্ভব নয়; কেননা, যদিচ সাহিত্যে ভালোমন্দের তারতম্য অগাধ, তবুও কোনো লেখক তাঁর লেখা যে প্রথমশ্রেণীর নয়, একথা নিজমুখে সমাজের কাছে জাহির করবেন না। সুতরাং বিজ্ঞাপনের উপর আস্থা স্থাপন ক'রে, হয় আমাদের বিশখানি বই একসঙ্গে কিনতে হয়, নয় কেনা থেকে নিরস্ত থাকতে হয়। ফলে দাঁড়ায় এই যে, বই বিক্রি হয় না। কেননা, ধীর বিশখানি বই কেনবার সংগতি আছে, তাঁর বিশ্বাস যে সাহিত্য নিয়ে কারবার করে শুধু লক্ষ্মীছাড়ার দল।

অর্ধমূল্যে এবং সিকিমূল্যে বিক্রি করবার দোষ যে, লোকের সহজেই সন্দেহ হয় যে বস্তাপচা সাহিত্যই শুধু ঐ উপায়ে ঝেড়ে ফেলা হয়। পয়সা খরচ করে গোলাম-চোর হতে লোকের বড়-একটা উৎসাহ হয় না।

কোনো বই ফাউ হিসেবে দেবার আমি সম্পূর্ণ বিপক্ষে। আর-পাঁচজনের বই লোকে পয়সা দিয়ে কিনবে এবং আমার বইখানি সেইসঙ্গে বিনে পয়সায় পাবে, একথা ভাবতে গেলেও লেখকের দোয়াতের কালি জল হয়ে আসে। লেখকদের এইরূপ প্রকাশে অপমান ক'রে সাহিত্যের মান কিংবা পরিমাণ দুয়ের কোনোটিই বাড়ানো যায় না। যদি কোনো বই বিনামূল্যে বিতরণ করতেই হয় তো প্রথম থেকে প্রথম সংস্করণ এইরূপ বিতরণ করা উচিত, যাতে করে পাঠকদের সঙ্গে সহজে সে বইটির পরিচয় করিয়ে দেওয়া যায়। উক্ত উপায়ে Tab-সিগারেট এদেশে চালানো হয়েছে। প্রথমে কিছুদিন বিলিয়ে দিয়ে, তারপর দ্বিগুণ দাম চাড়িয়ে সে সিগারেট আজকাল বাজারে বিক্রি করা হচ্ছে; এবং এত বিক্রি বোধ হয় অন্য-কোনো সিগারেটের নেই। বই-জিনিসটিকে ধূমপত্রের সঙ্গে তুলনা ক'রাটাও অসংগত নয়। কারণ অধিকাংশ বই কাগজে-মোড়া ধোঁয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। সে যাই হোক, আসল কথা হচ্ছে এই যে, বিজ্ঞাপনাদির দ্বারা লোকের মনে শুধু কেনবার

লোভ জন্মে দেওয়া যায় কিন্তু কেনানো যায় না। কোনো জিনিস কাউকে কেনাতে হলে সেটি প্রথমত তার হাতের গোড়ায় এগিয়ে দেওয়া চাই, তারপর সেটি তাকে গতিয়ে দেওয়া চাই। এ দুই বিষয়ে যে পুস্তকবিক্রেতারা বিশেষ কোনো যত্ন করেছেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। আমার বিশ্বাস যে, নতুন বাংলা বই যদি ঘরে-ঘরে ফেরি করে বিক্রি করা হয়, তাহলে বঙ্গসাহিত্যের প্রতি লক্ষ্মীর দৃষ্টি পড়বে।

সাহিত্যে প্রোডাকশন সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, ডিম্যাণ্ডের প্রতি লক্ষ্য রেখে সাহিত্য সাপ্লাই করতে হবে। যে বই লোকে পড়তে চায় না, সে বই অপর যে-কোনো উদ্দেশ্যেই লেখা হোক না কেন, বেচবার উদ্দেশ্যে লেখা চলে না। এবং কি ধরনের বই লোকে পড়তে চায়, সেবিষয়ে একটা সাধারণ কথা বলা যেতে পারে। এটি একটা প্রত্যক্ষ সত্য যে, সাধারণ পাঠকসমাজ দুই শ্রেণীর বই পছন্দ করে না—এক হচ্ছে ভালো, আর এক হচ্ছে মন্দ। যে বই ভালোও নয় মন্দও নয়, অমনি একরকম মাঝামাঝিগোছের—সেই বই মানুষ পড়তে ভালোবাসে এবং সেইজন্ম কেনে। প্রতি দেশে প্রতি যুগে প্রতি জাতির একটি বিশেষ সামাজিক বুদ্ধি থাকে। সে বুদ্ধির প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে সংসারযাত্রা-নির্বাহ করা, এবং সামাজিক জীবনের কাজেতেই সে বুদ্ধির সার্থকতা। কিন্তু সচরাচর লোকে সেই বুদ্ধির মাপকাঠিতেই দর্শন বিজ্ঞান সাহিত্য আট প্রভৃতি মনোজগতের পদার্থগুলোও মাপে নেয়। সে মাপে যে পদার্থ টি ছোট সাব্যস্ত হয় সেটিও যেমন গ্রাহ্য হয় না, তেমনি যেটি বড় সাব্যস্ত হয় সেটিও গ্রাহ্য হয় না। সামাজিক বুদ্ধির সঙ্গে যদি কোনো বিশেষ বুদ্ধি খাপেখাপে না মিলে যায়, তাহলে হয় তা অতিবুদ্ধি নয় নিব্বুদ্ধি; এবং এই উভয় শ্রেণীর বুদ্ধির সহিত সামাজিক মানব পারম্পর্যে কোনোরূপ সম্পর্ক রাখতে চায় না। এই কারণেই সাধারণত লোকে নিব্বুদ্ধিতার প্রতি অবজ্ঞা এবং অতিবুদ্ধির প্রতি বিদ্বেষভাব ধারণ করে। উঁচুদের লেখক এবং নীচুদের লেখক সমসাময়িক পাঠকসমাজের কাছে সমান অনাদর পায়। কারণ, বুদ্ধি চরিত্র প্রভৃতি সম্বন্ধে লোকসমাজ উঁচুতেও উঠতে চায় না, নীচুতেও নামতে চায় না; যেখানে আছে সেইখানেই থাকতে চায়। কেননা, গুণা এবং নামা দুটি ক্রিয়াই বিপজ্জনক। সমাজ 'বিষয়বালিশে আলিস্' রেখে নাটক-নভেলের দর্পণে নিজের পোশাকী চেহারা দেখতে চায়, কবির মুখে নিজের স্তুতি শুনতে ভালোবাসে, এবং যে গুরুর কাছ থেকে নিজ মতের ভাণ্ড লাভ করে তাঁকেই দার্শনিক বলে মাগ্ন করে। প্রমাণস্বরূপ দেখানো যেতে পারে, জর্জ মেরেডিথের অপেক্ষা মেরি করেলির নভেলের হাজার গুণ কাঁচি বেশি। এবং যে কবি সমাজের স্ন-মনোভাব ব্যক্ত করেন, তাঁর চাইতে, যিনি সমাজের কু-মনোভাব ব্যক্ত করেন, তাঁর আদর কিছু কম নয়। কিপ্লিংডের বই টেনিসনের বইয়ের চাইতে কম পয়সায় বিক্রি হয় না। স্তরাতঃ সাহিত্যব্যবসায়ীদের

পক্ষে ভালো বই লেখবার চেষ্টা করবার কোনো দরকার নেই ; বই যাতে খারাপ না হয়, এই চেষ্টাটুকু করলেই কার্যোদ্ধার হবে। এবং কি ভালো আর কি মন্দ, তা নির্ণয় করতে সমাজের প্রচলিত মতামতগুলি আয়ত্ত করতে হবে। এককথায়, ব্যাবসা চালাতে হলে যে রকমের সাহিত্য সমাজ চায়, তাই আমাদের যোগাতে হবে।—

‘নিত্য তুমি খেল যাহা, নিত্য ভালো নহে তাহা,
ভারত যেমত চাহে, সেই খেলা খেল হে’

এরূপ অনুরোধ করে যে কোনো ফল নেই, তা স্বয়ং ভারতচন্দ্র টের পেয়েছিলেন— আমরা তো কোন্ ছার। বাংলাদেশে কিরকমের বইয়ের সবচাইতে বেশি কাটতি, সেইটি জানতে পারলে বাঙালিজাতির মানসিক খোরাক যোগানো আমাদের পক্ষে কঠিন হবে না। শুনতে পাই, বাজারে শুধু রূপকথা, রামায়ণ-মহাভারতের আখ্যান এবং গল্পের বই কাটে। একথা যদি সত্য হয় তো আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে বালবৃদ্ধবনিতাতেই বাংলা বইয়ের ব্যাবসা টিকিয়ে রেখেছে। আর একথা যে সত্য, সেবিষয়ে সন্দেহ করবার কোনো কারণ নেই ; কেননা, মানুষ সবচাইতে ভালোবাসে গল্প। আমাদের অধিকাংশ লোকের জীবনের ইতিহাস সম্পূর্ণ ঘটনাশূণ্য, অর্থাৎ আমাদের বাহ্যিক কিংবা মানসিক জীবনে কিছু ঘটে না। দিনের পর দিন আসে, দিন যায়। আর সেসব দিনও একটি অপরটির যমজভ্রাতার গায়। বিশেষত এদেশে যেমন রাম না জন্মাতে রামায়ণ লেখা হয়েছিল, তেমনি আমরা না জন্মাতেই আমাদের জীবনের ইতিহাস সমাজ কর্তৃক লিখিত হয়ে থাকে। আমরা শুধু চিরজীবন তার আবৃত্তি করে যাই। সেই আবৃত্তি এখানে-ওখানে ভুলত্রাস্তিটুকুতেই পরস্পরের ভিতর যা বৈচিত্র্য। কিন্তু যন্ত্রবৎ চালিত হলেও মানুষ একথা একেবারে ভুলে যায় না যে, তারা কলের পুতুল নয়— ইচ্ছাশক্তিবিশিষ্ট স্বাধীন জীব। তাই নিজের জীবন ঘটনাশূণ্য হলেও অপর লোকের ঘটনাপূর্ণ জীবনের ইতিহাস চর্চা করে মানুষ সুখ পায়। অগুরূপ অবস্থায় পড়লে নিজের জীবনও নিতান্ত একঘেয়ে না হয়ে অপূর্ব বৈচিত্র্যপূর্ণ হতে পারত, এই মনে ক’রে আনন্দ অনুভব করে। মানুষের উপবাসী হৃদয়ের ক্ষুধা মেটাবার প্রধান সামগ্রী হচ্ছে গল্প, তা সত্যই হোক আর মিথ্যাই হোক। স্বী-সংগ্রহ করবার জগৎ আমাদের ধনুর্ভঙ্গ করতে হয় না, লক্ষ্যভেদও করতে হয় না, সেইজগৎই আমরা দ্রৌপদীস্বয়ংবর এবং রামচন্দ্রের বিবাহের কথা শুনতে ভালোবাসি। আমাদের বাড়ির ভিতর ‘কুন্দ’ও ফোটে না এবং বাড়ির বাহিরে ‘রোহিণী’ও জোটে না, তাই আমরা ‘বিষবৃক্ষ’ ও ‘ভ্রমর’ একবার পড়ি হু বার পড়ি তিনবার পড়ি। আমরা দশটায় আপিস যাই এবং পাঁচটায় ঠিক সেই একই পথ দিয়ে,

হয় গাড়িতে নয় ট্রামে নয় পদব্রজে, বাড়ি ফিরে আসি। তাই আমরা কল্পনায় শিক্ষাবাদের সঙ্গে দেশবিদেশে ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসি।

তাহলে স্থির হল এই যে, আমাদের প্রধান কার্য হবে গল্প-বলা— শুধু নভেল-নাটকে নয়, সকল বিষয়ে। ধর্মনাতি দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস— যত উপন্যাসের মত হবে ততই লোকের মনঃপূত হবে। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই যে, গল্প যত পুরনো হয় ততই সমাজের প্রিয় হয়ে ওঠে। প্রমাণ, রূপকথা এবং রামায়ণ-মহাভারতের কথা। এর কারণও স্পষ্ট। পুরনোর প্রধান গুণ যে তা নতুন নয়, অর্থাৎ অপরিচিত নয়। নতুনের প্রধান দোষ যে তা পরীক্ষিত নয়। স্মরণ্য তা সত্য কি মিথ্যা, উদ্ভাবনা কি আবিষ্কার, মানুষের পক্ষে শ্রেয় কি হেয়, তা একনজরে দেখে কেউ বলতে পারেন না। তাছাড়া নতুন কথা যদি সত্যও হয়, তাহলেও বিনা ওজরে গ্রাহ্য করা চলে না। মানুষের মন একটি হলেও মনোভাব অসংখ্য। এবং সে মন যতই ছোট হোক না কেন, একাধিক মনোভাব তাতে বাস করে। একত্রে বাস করতে হলে পরস্পর দিবারাত্র কলহ করা চলে না। তাই যেসকল মনোভাব বহুকাল থেকে আমাদের মন অধিকার করে বসে আছে, তারা ঐ সহবাসের গুণেই পরস্পর একটা সম্পর্ক পাতিয়ে নেয়, এবং স্মৃতি না হোক শান্তিতে ঘর করে। কিন্তু নতুন সত্যের ধর্মই হচ্ছে মানুষের মনের শান্তি ভঙ্গ করা। নতুন সত্য প্রবেশ করেই আমাদের মনের পাতা-ঘরকলা কতকটা এলোমেলো করে দেয়। স্মরণ্য ও-পদার্থ মনের ভিতর ঢুকলেই আমাদের মনের ঘর নতুন করে গোছাতে হয়; যেসব মনোভাব তার সঙ্গে একত্র থাকতে পারে না, তাদের বহিস্কৃত করে দিতে হয় এবং বাদবাকিগুলিকে একটু বদলেসদলে নিয়ে তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে দিতে হয়। তাছাড়া নতুন সত্য মনে উদয় হয়ে অনেক নতুন কর্তব্যবুদ্ধির উদ্রেক করে। আমরা চিরপরিচিত কর্তব্যগুলির দাবিই রক্ষা করতে হিম্‌সিম্‌ খেয়ে যাই, তারপর আবার যদি নিত্যনতুন কর্তব্য এসে নতুন-নতুন দাবি করতে আরম্ভ করে তাহলে জীবন যে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে, তার আর সন্দেহ কি? মানুষে স্থখ পায় না, তাই সোয়াস্তি চায়। যে লেখক পাঠকের মনের সেই সোয়াস্তিটুকু নষ্ট করতে ব্রতী হবেন, তাঁর প্রতি অধিকাংশ লোক বিমুখ ও বিরক্ত হবেন। স্মরণ্য ‘সাবধানের মার নেই’— এই স্মৃতির বলে যে লেখক যেকথা সকলে জানে সেইকথা গতোপতো অনর্গল বলে যাবেন, বাজারে তাঁর কথার মূল্য হবে। উপরে যা বলা গেল, তার নির্গলিতার্থ দাঁড়ায় এই যে, ব্যাবসার হিসেবে সাহিত্যে গল্প বলা এবং পুরনো গল্প বলাই শ্রেয়।

সাহিত্যের অবশ্য ডিম্বাণ্ড না বাড়লে সাপ্লাই বাড়বে না। স্মরণ্য সাহিত্যের ব্যাবসার শ্রীবুদ্ধি অনেক পরিমাণে পাঠকের মজির উপর নির্ভর করে, লেখকের

কৃতিত্বের উপর নয়। এদেশের শিক্ষিত লোকদের বই-পড়া জিনিসটে বড় একটা অভ্যাস নেই। সাহিত্যচর্চা করাটা নিত্যনৈমিত্তিক কিংবা কামা কোনোরূপ কর্মের মধ্যেই গণ্য নয়। এর বহুতর কারণ আছে; যথা অবসরের অভাব, অর্থের অভাব এবং ফায়দার অভাব; কারণ সাহিত্যচর্চা করবার লাভটি কেউ টাকায় ক'ষে বার করে দিতে পারেন না। যে বিঘে বাজারে ভাঙানো যায় না, তার যে মূল্য থাকতে পারে—এ বিশ্বাস সকলের নেই। কিন্তু স্কুলকলেজের বাইরে যে আমরা কোনো বই পড়ি না, তার প্রধান কারণ—স্কুলপাঠ্যপুস্তক পাঠ্যপুস্তকের প্রধান শত্রু। বছর বছর ধরে স্কুলপাঠ্যগ্রন্থাবলী গলাধঃকরণ করে যার মানসিক মন্দাগ্নি না জন্মায়, এমন লোক নিতান্ত বিরল। স্মতরাং শিক্ষিত সম্প্রদায়কে সাহিত্যচর্চা করবার উপদেশ দিয়ে কোনো লাভ নেই। কিন্তু বই-কেনাটা যে একটি শখমাত্র হতে পারে এবং হওয়া উচিত, এই ধারণাটি আমি স্বদেশী সমাজের মনে জন্মিয়ে দিতে চাই।

বই গৃহসজ্জার একটি প্রধান উপকরণ, এবং সেই কারণে শুধু ঘর সাজাবার জন্তে আমাদের বই কেনা উচিত। আমরা যে হিসেবে ছবি কিনি এবং ঘরে টাঙিয়ে রাখি, সেই একই হিসেবে বই কেনা এবং ঘরে সাজিয়ে রাখা আমাদের কর্তব্য। আমরা ছবি পড়ি নে বলে ছবি-কেনাটা যে অগ্নায়, একথা কেউ বলেন না, স্মতরাং বই পড়ি নে বলে যে কিনব না, একপ মনোভাব অসঙ্গত। এস্থলে বলে রাখা আবশ্যিক যে বইয়ের মত ছবিও একটা পড়বার জিনিস। ছবিরও একটা অর্থ আছে, একটা বক্তব্য কথা আছে। বইয়ের সঙ্গে ছবির একমাত্র তফাত হচ্ছে যে, উভয়ের ভাষা স্বতন্ত্র। যা একজন কালি ও কলমের সাহায্যে ব্যক্ত করেন, তাই অপর-একজন রং ও তুলির সাহায্যে প্রকাশ করেন। তাছাড়া, বাংলা বইয়ের সপক্ষে বিশেষ করে এই বলবার আছে যে, বাঙালি ক্রেতা ইচ্ছে করলে তা পড়তে পারেন, কিন্তু ছবি-জিনিসটে ইচ্ছে করলেও পড়তে পারেন না।

সচরাচর লোকে ঘর সাজার গৃহের শোভা বৃদ্ধি করবার জন্ত নয়, কিন্তু নিজের ধন এবং স্মৃষ্টির পরিচয় দেবার জন্ত। শেষোক্ত হিসেব থেকে দেখলেও দেখা যায় যে, বৈঠকখানার দেয়ালে হাজার টাকার একখানি নোট না ঝুলিয়ে হাজার টাকা দামের একখানি ছবি ঝোলানোতে যেমন অধিক স্মৃষ্টির পরিচয় দেয়, তেমনি নানা আকারের নানা বর্ণের রাশিরাশি বই সারিসারি সাজিয়ে রাখতে প্রমাণ হয় যে, গৃহকর্তা একাধারে ধনী এবং গুণী।

পূর্বোক্ত কারণে আমি এদেশের ধনী লোকদের বই কিনতে অনুরোধ করি, গিলতে নয়। তাঁরা যদি এবিষয়ে একবার পথ দেখান, তাহলে তাঁদের দৃষ্টান্ত সদৃষ্টান্ত হিসেবে

বহুলোকে অনুসরণ করবে। যতদিন না বাঙালিসমাজ নিজেদের পাঠক হিসেবে না দেখে পুস্তকক্রেতা হিসেবে দেখতে শিখবেন ততদিন বঙ্গসাহিত্যের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হবে না।

আমার শেষ কথা এই যে, গ্রন্থক্রেতা যে শুধু নিঃস্বার্থ পরোপকার করেন, তা নয়। চারি দিকে বইয়ের দ্বারা পরিবৃত হয়ে থাকতে একটা উপকার আছে। বই চব্বিশঘণ্টা চোখের সম্মুখে থেকে এই সত্যটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, এ পৃথিবীতে চামড়ায়-ঢাকা মন-নামক একটি পদার্থ আছে।

বৈশাখ :৩২০

বঙ্গসাহিত্যের নবযুগ

নানারূপ গল্পপত্র লেখবার এবং ছাপবার যতটা প্রবল বোঁক যত বেশি লোকের মধ্যে আজকাল এদেশে দেখা যায়, তা পূর্বে কখনো দেখা যায় নি। এমন মাস যায় না, যাতে অন্তত একখানি মাসিকপত্রের না আবির্ভাব হয়। এবং সেসকল মাসিকপত্রে সাহিত্যের সকলরকম মালমসলার কিছু-না-কিছু নমুনা থাকেই থাকে। স্মরণ্য একথা অস্বীকার করবার জো নেই যে, বঙ্গসাহিত্যের একটি নতুন যুগের সূত্রপাত হয়েছে। এই নবযুগের শিশু-সাহিত্য আঁতুড়েই মরবে কিংবা তার এক শ বৎসর পরমায়ু হবে, সেকথা বলতে আমি অপারগ। আমার এমন-কোনো বিদ্যে নেই, যার জোবে আমি পরের কুষ্টি কাটতে পারি। আমরা সমুদ্রপার হতে যেসকল বিদ্যার আমদানি করেছি, সামুদ্রিক বিদ্যা তার ভিতর পড়ে না। কিন্তু এই নবসাহিত্যের বিশেষ লক্ষণগুলির বিষয় যদি আমাদের স্পষ্ট ধারণা জন্মায়, তাহলে যুগধর্মাত্মায়ী সাহিত্যরচনা আমাদের পক্ষে অনেকটা সহজ হয়ে আসবে। পূর্বোক্ত কারণে নব্যলেখকরা তাঁদের লেখায় যে হাত দেখাচ্ছেন, সেই হাত দেখবার চেষ্টা করাটা একেবারে নিষ্ফল নাও হতে পারে।

প্রথমেই চোখে পড়ে যে, এই নবসাহিত্য রাজধর্ম ত্যাগ করে গণধর্ম অবলম্বন করছে। অতীতে অত্র দেশের গ্রাম এদেশের সাহিত্যজগৎ যখন দু-চার জন লোকের দখলে ছিল, যখন লেখা দূরে থাক পড়বার অধিকারও সকলের ছিল না, তখন সাহিত্যরাজ্যে রাজা সামন্ত প্রভৃতি বিরাজ করতেন; এবং তাঁরা কাব্য দর্শন ও ইতিহাসের ক্ষেত্রে মন্দির অট্টালিকা স্তূপ স্তম্ভ গুহা প্রভৃতি আকারে বহু চিরস্থায়ী কীর্তি রেখে গেছেন। কিন্তু বর্তমান যুগে আমাদের দ্বারা কোনোরূপ প্রকাণ্ড কাণ্ড করে তোলা অসম্ভব, এই জ্ঞানটুকু জন্মালে আমাদের কারও আর সাহিত্যে রাজা হবার লোভ থাকবে না এবং শব্দের কীর্তিস্তম্ভ গড়বার বৃথা চেষ্টায় আমরা দিন ও শরীর পাত করব না। এর জন্ত আমাদের কোনোরূপ দুঃখ করবার আবশ্যিক নেই। বস্তুজগতের গ্রাম সাহিত্যজগতেরও প্রাচীন কীর্তিগুলি দূর থেকে দেখতে ভালো, কিন্তু নিত্যব্যবহাষ নয়।

দর্শনের কুতবমিনারে চড়লে আমাদের মাথা ঘোরে; কাব্যের তাজমহলে রাত্রিবাস করা চলে না, কেননা অত সৌন্দর্যের বুকে ঘুমিয়ে পড়া কঠিন। ধর্মের পর্বতগুহার অভ্যন্তরে খাড়া হয়ে দাঁড়ানো যায় না, আর হামাগুড়ি দিয়ে অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ালেই যে কোনো অমূল্য চিন্তামণি আমাদের হাতে ঠেকতে বাধ্য, এ বিশ্বাসও আমাদের

চলে গেছে। পুরাকালে মানুষে যা-কিছু গড়ে গেছে, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে সমাজ হতে আলাগা করা, দু-চারজনকে বহুলোক হতে বিচ্ছিন্ন করা। অপরপক্ষে নবযুগের ধর্ম হচ্ছে— মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন করা, সমগ্র সমাজকে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ করা, কাউকেও ছাড়া নয়, কাউকেও ছাড়তে দেওয়া নয়। এ পৃথিবীতে বৃহৎ না হলে যে কোনো জিনিস মহৎ হয় না, এরূপ ধারণা আমাদের নেই; সুতরাং প্রাচীন সাহিত্যের কীর্তির তুলনায় নবীন সাহিত্যের কীর্তিগুলি আকারে ছোট হয়ে আসবে, কিন্তু প্রকারে বেড়ে যাবে; আকাশ আক্রমণ না করে মাটির উপর অধিকার বিস্তার করবে। অর্থাৎ ভবিষ্যতে কাব্যদর্শনাদি আর গাছের মত উঁচুর দিকে ঠেলে উঠবে না, ঘাসের মত চারি দিকে চারিয়ে যাবে। এককথায় বহুশক্তিশালী স্বল্পসংখ্যক লেখকের দিন চলে গিয়ে স্বল্পশক্তিশালী বহুসংখ্যক লেখকের দিন আসছে। আমাদের মনোজগতে যে নবস্বর্ঘ উদয়োন্মুখ, তার সহস্র রশ্মি অবলম্বন করে অন্তত ষষ্টি সহস্র বালখিল্য-লেখক এই ভূভারতে অবতীর্ণ হবেন। এরূপ হবার কারণও সুস্পষ্ট। আজকাল আমাদের ভাববার সময় নেই, ভাববার অবসর থাকলেও লেখবার যথেষ্ট সময় নেই, লেখবার অবসর থাকলেও লিখতে শেখবার অবসর নেই; অথচ আমাদের লিখতেই হবে, নচেৎ মাসিকপত্র চলে না। এ যুগের লেখকরা যেহেতু গ্রন্থকার নন, শুধু মাসিকপত্রের পৃষ্ঠপোষক, তখন তাঁদের ঘোড়ায় চড়ে লিখতে না হলেও ঘড়ির উপর লিখতে হয়; কেননা, মাসিকপত্রের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে পয়লা বেরনো; কি যে বেরলো, তাতে বেশি-কিছু আসে-যায় না। তাছাড়া, আমাদের সকলকেই সকল বিষয়ে লিখতে হয়। নীতির জুতোশেলাই থেকে ধর্মের চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত সকল ব্যাপারই আমাদের সমান অধিকারভুক্ত। আমাদের নবসাহিত্যে কোনোরূপ 'শ্রমবিভাগ' নেই, তার কারণ যে ক্ষেত্রে 'শ্রম'-নামক মূল পদার্থেরই অভাব সেন্ধলে তার বিভাগ আর কি করে হতে পারে।

তাই আমাদের হাতে জন্মলাভ করে শুধু ছোটগল্প খণ্ডকাব্য সরলবিজ্ঞান ও তরলদর্শন।

দেশকালপাত্রের সমবায় সাহিত্য যে ক্ষুদ্রধর্মাবলম্বী হয়ে উঠেছে, তার জগৎ আমার কোনো খেদ নেই। একালের রচনা ক্ষুদ্র বলে আমি দুঃখ করি নে, আমার দুঃখ যে তা যথেষ্ট ক্ষুদ্র নয়। একে স্বল্পায়তন, তার উপর লেখাটি যদি ফাঁপা হয়, তাহলে সে জিনিসের আদর করা শক্ত। বালা গালাভরা হলেও চলে, কিন্তু আংটি নিরেট হওয়া চাই। লেখকরা এই সত্যটি মনে রাখলে গল্প স্বল্প হয়ে আসবে, শোক শ্লোক-রূপ ধারণ করবে, বিজ্ঞান বামনরূপ ধারণ করেও ত্রিলোক অধিকার করে থাকবে এবং দর্শন নখদর্পণে পরিণত হবে। ধারা মানসিক আরামের চর্চা না করে ব্যায়ামের চর্চা

করেছেন, তাঁরা সকলেই জানেন যে, যে সাহিত্যে দম নেই, তাতে অস্বত কস (grip) থাকা আবশ্যিক।

২

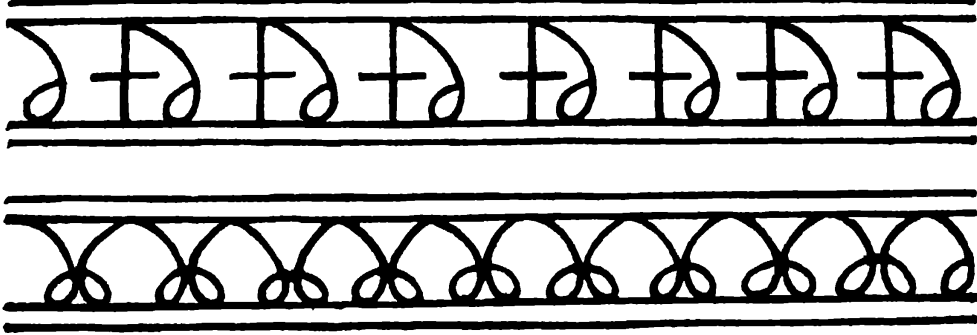
বর্তমান ইউরোপের সম্যক পরিচয়ে এই জ্ঞান লাভ করা যায় যে, গণধর্মের প্রধান বোঁক হচ্ছে বৈশ্বধর্মের দিকে ; এবং সেই বোঁকটি না সামলাতে পারলে সাহিত্যের পরিণাম অতি ভয়াবহ হয়ে ওঠে। আমাদের এই আত্মসর্বস্ব দেশে লেখকেরা যে বৈশ্ববৃত্তি অবলম্বন করবেন না, একথাও জোর করে বলা চলে না। লক্ষ্মীলাভের আশায় সরস্বতীর কপট সেবা করতে অনেকে প্রস্তুত, তার প্রমাণ 'ভ্যালু-পেয়বল্ পোস্ট' নিত্য ঘরে ঘরে দিচ্ছে। আমাদের নবসাহিত্যের যেন-তেন-প্রকারেণ বিকিয়ে যাবার প্রবৃত্তিটি যদি দমন করতে না পারা যায়, তাহলে বঙ্গসরস্বতীকে যে পথে দাঁড়াতে হবে, সেবিষয়ে তিলমাত্রও সন্দেহ নেই। কোনো শাস্ত্রেই একথা বলে না যে, 'বাণিজ্যে বসতে সরস্বতী'। সাহিত্যসমাজে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করবার ইচ্ছে থাকলে দারিদ্র্যকে ভয় পেলে সে আশা সফল হবে না। সাহিত্যের বাজার-দর সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যত বাড়বে, সেইসঙ্গে তার মূল্য সম্বন্ধে জ্ঞান আমাদের লোপ পেয়ে আসবে। সুতরাং আমাদের নবসাহিত্যে লোভ-নামক রিপূর অস্তিত্বের লক্ষণ আছে কি না, সেবিষয়ে আমাদের দৃষ্টি থাকা আবশ্যিক ; কেননা, শাস্ত্রে বলে, লোভে পাপ পাপে মৃত্যু।

৩

এ যুগের মাসিকপত্রসকল যে সচিত্র হয়ে উঠেছে সেটি যেমন আনন্দের কথা, তেমন আশঙ্কারও কথা। ছবির প্রতি গণসমাজের যে একটি নাড়ির টান আছে, তার প্রচলিত প্রমাণ হচ্ছে মার্কিন সিগারেট। ঐ চিত্রের সাহচর্যেই যত অচল সিগারেট বাজারে চলে যাচ্ছে ; এবং আমরা চিত্রমুগ্ধ হয়ে মহানন্দে তাম্রকূটজ্ঞানে খড়ের ধূম পান করছি। ছবি ফাউ দিয়ে মেকি মাল বাজারে কাটিয়ে দেওয়াটা আধুনিক ব্যাবসার একটা প্রধান অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদেশে শিশুপাঠ্য গ্রন্থাবলীতেই চিত্রের প্রথম আবির্ভাব। পুস্তিকায় এবং পত্রিকায় ছেলেভুলোনো ছবির বহুল প্রচারে চিত্রকলার যে কোনো উন্নতি হবে, সেবিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে ; কেননা সমাজে গোলাম পাশ করে দেওয়াতেই বণিক-বুদ্ধির সার্থকতা, কিন্তু সাহিত্যের যে অবনতি হবে, সেবিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই। নর্তকীর পশ্চাৎ-পশ্চাৎ সারঙ্গীর মত চিত্রকলার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ কাব্যকলার অহুধাবন করাতে তার পদমর্ধাদা বাড়ে না। একজন যা করে, অপরে তার দোষগুণ বিচার করে,

এই হচ্ছে সংসারের নিয়ম। সুতরাং ছবির পাশাপাশি তার সমালোচনাও সাহিত্যে দেখা দিতে বাধ্য। এই কারণেই যেদিন থেকে বাংলাদেশে চিত্রকলা আবার নবকলেবর ধারণ করেছে, তার পরদিন থেকেই তার অনুকূল এবং প্রতিকূল সমালোচনা শুরু হয়েছে। এবং এই মতদ্বৈধ থেকে সাহিত্যসমাজে একটি দলাদলির সৃষ্টি হবার উপক্রম হয়েছে। এই তর্কযুদ্ধে আমার কোনো পক্ষ অবলম্বন করবার সাহস নেই। আমার বিশ্বাস, এদেশে একালের শিক্ষিত লোকদের মধ্যে চিত্রবিদ্যায় বৈদগ্ধ্য এবং আলেখ্য-ব্যাখ্যানে নিপুণতা অতিশয় বিরল, কারণ এ যুগের বিদ্যার মন্দিরে স্কন্দরের প্রবেশ নিষেধ। তবে বঙ্গদেশের নব্যচিত্র সম্বন্ধে সচরাচর যেসকল আপত্তি উত্থাপন করা হয়ে থাকে, সেগুলি সংগত কি অসংগত তা বিচার করবার অধিকার সকলেরই আছে; কেননা, সেসকল আপত্তি কলা-জ্ঞান নয়, সাধারণ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। যতদূর আমি জানি, নব্যচিত্রকরদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ এই যে, তাঁদের রচনায় বর্ণে-বর্ণে বানান-ভুল এবং রেখায়-রেখায় ব্যাকরণ-ভুল দৃষ্ট হয়। একথা সত্য কি মিথ্যা শুধু তাঁরাই বলতে পারেন, যাঁদের চিত্রকর্মের ভাষার উপর সম্পূর্ণ অধিকার জন্মেছে; কিন্তু সে ভাষায় সুপণ্ডিত ব্যক্তি বাংলাদেশের রাস্তাঘাটে দেখতে পাওয়া যায় না; যদিচ ওসকল স্থানে সমালোচকের দর্শন পাওয়া দুর্লভ নয়। আসল কথা হচ্ছে, এ শ্রেণীর চিত্র-সমালোচকেরা অনুকরণ-অর্থে ব্যাকরণ-শব্দ ব্যবহার করেন। এঁদের মতে ইউরোপীয় চিত্রকরেরা প্রকৃতির অনুকরণ করেন, সুতরাং সেই অনুকরণের অনুকরণ করাটাই এদেশের চিত্রশিল্পীদের কর্তব্য। প্রকৃতি-নামক বিরাট পদার্থ এবং তার অংশভূত ইউরোপ-নামক ভূভাগ, এ উভয়ের প্রতি আমার যথোচিত ভক্তি-শ্রদ্ধা আছে; কিন্তু তাই বলে তার অনুকরণ করাটাই যে পরম-পুরুষার্থ, একথা আমি কিছুতেই স্বীকার করতে পারি নে। প্রকৃতির বিকৃতি ঘটানো কিংবা তার প্রতিকৃতি গড়া কলাবিদ্যার কার্য নয়, কিন্তু তাকে আকৃতি দেওয়াটাই হচ্ছে আর্টের ধর্ম। পুরুষের মন প্রকৃতিনর্তকীর মুখ দেখবার আয়না নয়। আর্টের ক্রিয়া অনুকরণ নয়, সৃষ্টি। সুতরাং বাহুবস্তুর মাপজোকের সঙ্গে আমাদের মানসজাত বস্তুর মাপজোক যে ছবাহব মিলে যেতেই হবে, এমন-কোনো নিয়মে আর্টকে আবদ্ধ করার অর্থ হচ্ছে প্রতিভার চরণে শিকলি পবানো। আর্টে অবশ্য যথেষ্টাচাচিতার কোনো অবসর নেই। শিল্পীরা কলাবিদ্যার অনন্তসামান্য কঠিন বিধিনিষেধ মানতে বাধ্য, কিন্তু জ্যামিতি কিংবা গণিতশাস্ত্রের শাসন নয়। একটি উদাহরণের সাহায্যে আমার পূর্বোক্ত মতের যথার্থতার প্রমাণ অতি সহজেই দেওয়া যেতে পারে; একে একে যে দুই হয়, এবং একের পিঠে এক দিলে যে এগারো হয়—বৈজ্ঞানিক হিসেবে এর চাইতে খাটি গত্য পৃথিবীতে আর কিছুই নেই। অথচ একে একে দুই না হয়েও, এবং একের পিঠে

একে এগারো না হয়েও, ঐরূপ যোগাযোগে যে বিচিত্র নকশা হতে পারে, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ নীচে দেওয়া যাচ্ছে—



সম্ভবত আমার প্রদর্শিত যুক্তির বিরুদ্ধে কেউ একথা বলতে পারেন যে, ‘চিত্রে আমরা গণিতশাস্ত্রের সত্য চাই নে, কিন্তু প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সত্য দেখতে চাই’। প্রত্যক্ষ সত্য নিয়ে মানুষে মানুষে মতভেদ এবং কলহ যে আবহমান কাল চলে আসছে, তার কারণ অন্ধের হস্তীদর্শন গ্ৰায়ে নির্ণীত হয়েছে। প্রকৃতির যে অংশ এবং যে ভাবটির সঙ্গে যার চোখের এবং মনের যতটুকু সম্পর্ক আছে, তিনি সেইটুকুকেই সমগ্র সত্য বলে ভুল করেন। সত্যব্রষ্ট হলে বিজ্ঞানও হয় না, আর্টও হয় না; কিন্তু বিজ্ঞানের সত্য এক, আর্টের সত্য অপর। কোনো স্নন্দরীর দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং ওজনও যেমন এক হিসাবে সত্য, তার সৌন্দর্যও তেমনি আর-এক হিসাবে সত্য। কিন্তু সৌন্দর্য-নামক সত্যটি তেমন ধরাছোঁয়ার মত পদার্থ নয় বলে সেসম্বন্ধে কোনোরূপ অকাটা বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দেওয়া যায় না। এই সত্যটি আমরা মনে রাখলে নব্যশিল্পীর ক্রুশাঙ্গী মানসীকৃষ্ণাদের ভাঙার দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নেবার জ্ঞান অত ব্যগ্র হতুম না; এবং চিত্রের ঘোড়া ঠিক ঘোড়ার মত নয়, এ আপত্তিও উত্থাপন করতুম না; একথা বলার অর্থ— তার অস্থিসংস্থান, পেশীর বন্ধন প্রভৃতি প্রকৃত ঘোড়ার অনুরূপ নয়। অ্যানাটমি অর্থাৎ অস্থিবিদ্যার সাহায্যে দেখানো যেতে পারে যে, চিত্রের ঘোটক গঠনে ঠিক আমাদের শকটবাহী ঘোটকের সহোদর নয়, এবং উভয়কে একত্রে জুড়িতে জোতা যায় না। এসম্বন্ধে আমার প্রথম বক্তব্য এই যে, অস্থিবিদ্যা কঙ্কালের জ্ঞানের উপর নির্ভর করে, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর নয়। কঙ্কালের সঙ্গে সাধারণ লোকের চাক্ষুষ পরিচয় নেই; কারণ দেহতান্ত্রিকের জ্ঞানেত্রে যাই হোক, আমাদের চোখে প্রাণীজগৎ কঙ্কালসার নয়। স্নতরাং দৃষ্টজগৎকে অদৃষ্টের কষ্টিপাথরে কষে নেন্দ্র্যাতে পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু রূপজ্ঞানের পরিচয় দেওয়া হয় না। দ্বিতীয় কথা এই যে, কি মানুষ কি পশু, জীবমাত্রেরই দেহযন্ত্রগঠনের একমাত্র কারণ হচ্ছে উক্ত যন্ত্রের সাহায্যে কতকগুলি ক্রিয়া সম্পাদন করা। গঠন যে ক্রিয়াসাপেক্ষ, এই হচ্ছে দেহ-

বিজ্ঞানের মূল তত্ত্ব। ঘোড়ার দেহের বিশেষ গঠনের কারণ হচ্ছে, ঘোড়া তুরঙ্গম। যে ঘোড়া দৌড়বে না, তার অ্যানাটমি ঠিক জীবন্ত ঘোড়ার মত হবার কোনো বৈধ কারণ নেই। পটস্থ ঘোড়া যে তটস্থ, এবিষয়ে বোধ হয় কোনো মতভেদ নেই। চিত্রার্পিত অশ্বের অ্যানাটমি ঠিক চড়বার কিংবা হাঁকাবার ঘোড়ার অনুরূপ করাতেই বস্তুজ্ঞানের অভাবের পরিচয় দেওয়া হয়। চলৎশক্তিরহিত অশ্ব, অর্থাৎ যাকে চাবুক মারলে ছিঁড়বে কিন্তু নড়বে না এহেন ঘোটক, অর্থহীন অনুকরণের প্রসাদেই জীবন্ত ঘোটকের অবিকল আকার ধারণ করে চিত্রকর্মে জন্মলাভ করে। এই পঞ্চভূতাত্মক পরিদৃশ্যমান জগতের অন্তরে একটি মানসপ্রসূত দৃশ্যজগৎ সৃষ্টি করাই চিত্রকলার উদ্দেশ্য, সুতরাং এ উভয়ের রচনার নিয়মের বৈচিত্র্য থাকা অবশ্যসম্ভাবী। তথাকথিত নব্যচিত্র যে নির্দোষ কিংবা নিভুল, এমন কথা আমি বলি না। যে বিদ্যা কাল জন্মগ্রহণ করেছে, আজ যে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-সকল সম্পূর্ণ আত্মবশে আসবে, এরূপ আশা করাও বৃথা।

শিল্পহিসাবে তার নানা ক্রটি থাকা কিছুই আশ্চর্যের বিষয় নয়। কোথায় কলার নিয়মের ব্যভিচার ঘটছে, সমালোচকদের তাই দেখিয়ে দেওয়া কর্তব্য। অস্থি নয় বর্ণের সংস্থানে, পেশী নয় রেখার বন্ধনে—যেখানে অসংগতি এবং শিথিলতা দেখা যায়, সেইস্থলেই সমালোচনার সার্থকতা আছে। অব্যবসায়ীর অযথা নিন্দায় চিত্রশিল্পীদের মনে শুধু বিদ্রোহীভাবের উদ্রেক করে, এবং ফলে তাঁরা নিজেদের দোষগুলিকেই গুণ ভ্রমে বুক আঁকড়ে ধরে রাখতে চান।

আমার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে সাহিত্য, চিত্র নয়। যেহেতু এ যুগের সাহিত্য চিত্রসনাথ হয়ে উঠেছে, সেই কারণেই চিত্রকলার বিষয় উল্লেখ করতে বাধ্য হয়েছি। আমার ও-প্রসঙ্গ উত্থাপন করবার অপর-একটি কারণ হচ্ছে এইটি দেখিয়ে দেওয়া যে, যা চিত্রকলায় দোষ বলে গণ্য তাই আবার আজকাল এদেশে কাব্যকলায় গুণ বলে মাগ।

প্রকৃতির সহিত লেখকদের যদি কোনোরূপ পরিচয় থাকত, তাহলে শুধু বর্ণের সঙ্গে বর্ণের খোজনা করলেই যে বর্ণনা হয়, এ বিশ্বাস তাঁদের মনে জন্মাত না : এবং যে বস্তু কখনও তাঁদের চর্মচক্ষুর পথে উদয় হয়নি, তা অপরের মনচক্ষুর স্রমুখে খাড়া করে দেবার চেষ্টারূপ পশুশ্রম তাঁরা করতেন না। সম্ভবত এ যুগের লেখকদের বিশ্বাস যে, ছবির বিষয় হচ্ছে দৃশ্যবস্তু, আর লেখার বিষয় হচ্ছে অদৃশ্য মন ; সুতরাং বাস্তবিকতা চিত্রকলায় অর্জনীয় এবং কাব্যকলায় বর্জনীয়। সাহিত্যে সেহাইকলমের কাজ করতে গিয়ে যাঁরা শুধু কলমের কালি ঝাড়ে, তাঁরাই কেবল নিজের মনকে প্রবোধ দেবার জন্ত পূর্বোক্ত মিথ্যাটিকে সত্য বলে গ্রাহ করেন। ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ জ্ঞানই হচ্ছে সকল জ্ঞানের মূল। বাহ্যজ্ঞানশূন্যতা অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক নয়। দূরদৃষ্টি লাভ করার অর্থ চোখে চালশে-

ধরা নয়। দেহের নবদ্বার বন্ধ করে দিলে মনের ঘর অলৌকিক আলোকে কিংবা পারলৌকিক অন্ধকারে পূর্ণ হয়ে উঠবে— বলা কঠিন। কিন্তু সর্বলোকবিদিত সহজ সত্য এই যে, ঋার ইন্দ্রিয় সচেতন এবং সজাগ নয়, কাব্যে কৃতিত্ব লাভ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। জ্ঞানাঞ্জন-শলাকার অপপ্রয়োগে ঋাদের চক্ষু উন্মালিত না হয়ে কানা হয়েছে, তাঁরাই কেবল এ সত্য মানতে নারাজ হবেন। প্রকৃতিদত্ত উপাদান নিয়েই মন বাক্যচিত্র রচনা করে। সেই উপাদান সংগ্রহ করবার, বাছাই করবার এবং ভাষায় সাকার করে তোলবার ক্ষমতার নামই কবিত্বশক্তি। বস্তুজ্ঞানের অটল ভিত্তির উপরেই কবিকল্পনা প্রতিষ্ঠিত। মহাকবি ভাস বলেছেন যে, ‘স্বনিবিষ্ট লোকের রূপ বিপর্যয়’ করা অন্ধকারের ধর্ম। সাহিত্যে ওরূপ করাতে প্রতিভার পরিচয় দেওয়া হয় না; কারণ প্রতিভার ধর্ম হচ্ছে প্রকাশ করা, অপ্রত্যক্ষকে প্রত্যক্ষ করা— প্রত্যক্ষকে অপ্রত্যক্ষ করা নয়। অলংকারশাস্ত্রে বলে, অপ্রকৃত অতিপ্রকৃত এবং লৌকিক-জ্ঞান-বিরুদ্ধ বর্ণনা কাব্যে দোষ হিসেবে গণ্য। অবশ্য পৃথিবীতে যা সত্যই ঘটে থাকে, তার যথাযথ বর্ণনাও সব সময়ে কাব্য নয়। অলংকারিকেরা উদাহরণস্বরূপ দেখান যে, ‘গৌ তৃণং অস্তি’ কথাটা সত্য হলেও ওকথা বলায় কবিত্বশক্তির বিশেষ পরিচয় দেওয়া হয় না। তাই বলে ‘গোরুরা ফুলে ফুলে মধুপান করছে’ এরূপ কথা বলাতে, কি বস্তুজ্ঞান কি রসজ্ঞান, কোনোরূপ জ্ঞানের পরিচয় দেওয়া হয় না। এস্থলে বলে রাখা আবশ্যিক যে, নিজেদের সকলপ্রকার ক্রটির জ্ঞান আমাদের পূর্বপুরুষদের দায়ী করা বর্তমান ভারতবাসীদের একটা রোগের মধ্যে হয়ে পড়েছে। আমাদের বিশ্বাস, এ বিশ্ব নশ্বর এবং মায়াময় বলে আমাদের পূর্বপুরুষেরা বাহ্যজগতের কোনোরূপ খোঁজখবর রাখতেন না। কিন্তু একথা জোর করে বলা যেতে পারে যে, তাঁরা কস্মিনকালেও অবিদ্যাকে পরাবিদ্যা বলে ভুল করেন নি, কিংবা একলক্ষ্যে যে মনের পূর্বোক্ত প্রথম অবস্থা হতে দ্বিতীয় অবস্থায় উত্তীর্ণ হওয়া যায়— এরূপ মতও প্রকাশ করেন নি। বরং শাস্ত্র এই সত্যেরই পরিচয় দেয় যে, অপরাবিদ্যা সম্পূর্ণ আয়ত্ত না হলে কারও পক্ষে পরাবিদ্যা লাভের অধিকার জন্মায় না; কেননা, বিরাটের জ্ঞানের ক্ষেত্রেই স্বরাটের জ্ঞান অঙ্কুরিত হয়। আসল কথা হচ্ছে, মানসিক আলগুবশতই আমরা সাহিত্যে সত্যের ছাপ দিতে অসমর্থ। আমরা যে কথায় ছবি আঁকতে পারি নে, তার একমাত্র কারণ— আমাদের চোখ ফোটবার আগে মুখ ফোটে।

একদিকে আমরা বাহ্যবস্তুর প্রতি যেমন বিরক্ত, অপরদিকে অহং-এর প্রতি ঠিক তেমনি অহুরক্ত; আমাদের বিশ্বাস যে, আমাদের মনে যেসকল চিন্তা ও ভাবের উদয় হয়, তা এতই অপূর্ব এবং মহার্ঘ যে, স্বজাতিকে তার ভাগ না দিলে ভারতবর্ষের

আর দৈগ্ধ ঘুচবে না। তাই আমরা অহ্নিশি কাব্যে ভাবপ্রকাশ করতে প্রস্তুত। ঐ ভাবপ্রকাশের অদম্য প্রবৃত্তিটিই আমাদের সাহিত্যে সকল অনর্থের মূল হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার মনোভাবের মূল্য আমার কাছে যতই বেশি হোক না, অপরের কাছে তার যাকিছু মূল্য সে তার প্রকাশের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। অনেকখানি ভাব ম'রে একটুখানি ভাষায় পরিণত না হলে রসগ্রাহী লোকের নিকট তা মুখরোচক হয় না। এই ধারণাটি যদি আমাদের মনে স্থান পেত, তাহলে আমরা সিকি পয়সার ভাবে আত্মহারা হয়ে কলার অমূল্য আত্মসংযম হতে ভ্রষ্ট হতুম না। মানুষমাত্রেই মনে দিব্যরাত্র নানাক্রম ভাবের উদয় এবং বিলয় হয়— এই অস্থির ভাবকে ভাষায় স্থির করবার নামই হচ্ছে রচনাশক্তি। কাব্যের উদ্দেশ্য ভাব প্রকাশ করা নয়, ভাব উদ্বেক করা। কবি যদি নিজেই বীণাহিসেবে না দেখে বাদকহিসেবে দেখেন, তাহলে পরের মনের উপর আধিপত্য লাভ করবার সম্ভাবনা তাঁর অনেক বেড়ে যায়। এবং যে মুহূর্ত থেকে কবিরা নিজেদের পরের মনোবীণার বাদকহিসেবে দেখতে শিখবেন, সেই মুহূর্ত থেকে তাঁরা বস্তুজ্ঞানের এবং কলার নিয়মের একান্ত শাসনাধীন হবার সার্থকতা বুঝতে পারবেন। তখন আর নিজের ভাববস্তুকে এমন দিব্যরত্ন মনে করবেন না যে, সেটিকে আকার দেবার পরিশ্রম থেকে বিমুখ হবেন। অবলৌলাক্রমে রচনা করা আর অবহেলাক্রমে রচনা করা যে এক জিনিস নয়, একথা গণধর্মান্বলম্বীরা সহজে মানতে চান না— এই কারণেই এত কথা বলা।

আমার শেষ বক্তব্য এই যে, ক্ষুদ্রত্বের মধ্যেও যে মহত্ত্ব আছে, আমাদের নিত্য-পরিচিত লৌকিক পদার্থের ভিতরেও যে অলৌকিকতা প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে, তার উদ্ধাবসাধন করতে হলে, অব্যক্তকে ব্যক্ত করতে হলে, সাধনার আবশ্যিক; এবং সে সাধনার প্রক্রিয়া হচ্ছে, দেহমনকে বাহ্যজগৎ এবং অন্তর্জগতের নিয়মাধীন করা। ষাঁর চোখ নেই, তিনিই কেবল সৌন্দর্যের দর্শনলাভের জগৎ শিবনেত্র হন; এবং ষাঁর মন নেই, তিনিই মনস্বিতা লাভের জগৎ অগ্নমনস্কতার আশ্রয় গ্রহণ করেন। নব্যলেখকদের নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা এই যে, তাঁরা যেন দেশী বিলেতি কোনোরূপ বুলির বশবর্তী না হয়ে, নিজের অন্তর্নিহিত শক্তির পরিচয় লাভ করবার জগৎ ব্রতী হন। তাতে পরের না হোক, অন্তত নিজের উপকার করা হবে।

নোবেল প্রাইজ

সব জিনিসেরই দুটি দিক আছে— একটি সদর, আর-একটি মফস্বল। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন বলে বহুলোক যে খুশি হয়েছেন, তার প্রমাণ তো হাতেহাতেই পাওয়া যাচ্ছে ; কিন্তু সকলে যে সমান খুশি হন নি, এ সত্যটি তেমন প্রকাশ হয়ে পড়ে নি। এই বাংলাদেশের একজন লোকের, অর্থাৎ লেখকসম্প্রদায়ের, এ ঘটনায় হরিষে-বিষাদ ঘটেছে। আমি একজন লেখক, সুতরাং কি কারণে ব্যাপারটি আমাদের কাছে গুরুতর বলে মনে হচ্ছে সেইকথা আপনাদের কাছে নিবেদন করতে ইচ্ছা করি।

প্রথমত, যখন একজন বাঙালি লেখক এই পুরস্কার লাভ করেছেন তখন আর-একজনও যে পেতে পারে, এই ধারণা আমাদের মনে এমনি বদ্ধমূল হয়েছে যে, তা উপড়ে ফেলতে গেলে আমাদের বুক ফেটে যাবে। অবশ্য আমরা কেউ রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ নই, বড়জোর তাঁর সপক্ষ কিংবা বিপক্ষ। তাই বলে পড়তাটা যখন এদিকে পড়েছে তখন আমরা যে নোবেল প্রাইজ পাব না— এ হতে পারে না। সাহিত্যের রাজটিকা লাভ করা যায় কপালে। তাই বলছি, আশার আকাশে দৌলুয়মান এই টাকার খলিটি চোখের স্মুখে থাকাতে লেখা-জিনিসটে আমাদের কাছে অতি স্কঠিন হয়ে উঠেছে।

স্বর্গ যদি অকস্মাৎ প্রত্যক্ষ হয় আর তার লাভের সম্ভাবনা নিকট হয়ে আসে, তাহলে মানুষের পক্ষে সহজ মানুষের মত চলাফেরা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। চলাফেরা দূরে যাক, তার পক্ষে পা ফেলাই অসম্ভব হয়— এই ভয়ে, পাছে হাতের স্বর্গ পায়ে ঠেলি। তেমনি নোবেল প্রাইজের সাক্ষাৎ পাওয়া অবধি লেখা সম্বন্ধে দায়িত্বজ্ঞান আমাদের এত বেড়ে গেছে যে, আমরা আর হাল্কাভাবে কলম ধরতে পারি নে।

এখন থেকে আমরা প্রতি ছত্র সুইডিশ অ্যাকাডেমির মুখ চেয়ে লিখতে বাধ্য। অথচ যেদেশে ছমাস দিন আর ছমাস রাত, সেদেশের লোকের মন যে কি করে পাব তাও বুঝতে পারি নে। এইটুকু মাত্র জানি যে, আমাদের রচনায় অর্ধেক আলো আর অর্ধেক ছায়া দিতে হবে ; কিন্তু কোথায় এবং কি ভাবে, তার হিসেব কে বলে দেয়। সুইডেন যদি বারোমাস রাতের দেশ হত, তাহলে আমরা নির্ভয়ে কাগজের উপর কালির পোচড়া দিয়ে যেতে পারতুম ; আর যদি বারোমাস দিনের দেশ হত, তাহলেও নয় ভরসা করে সাদা কাগজ পাঠাতে পারতুম। কিন্তু অবস্থা অগ্ররূপ হওয়াতেই আমরা উভয়সংকটে পড়েছি।

দ্বিতীয় মুশকিলের কথা এই যে, অত্যাধি বাংলা আর বাঙালিভাবে লেখা চলবে না। ভবিষ্যতে ইংরেজি তরজমার দিকে এক নজর রেখে— এক নজর কেন, পুরো নজর